একটি ভৌতিক ঘটনার অন্তরালে

এম, এ, জলিল

জাদু শিল্পী

সিডনী থেকে

পিলে চম্‌কানো ভূতের ঘটনাটি যে গ্রামে ঘটেছিল সেই গ্রামের নাম আলগীচর (আমার নিজের গ্রাম)। ভৌতিক ঘটনাটি তুলে ধরার পূর্বে এই গ্রামের কিছু তথ্য পাঠকের জন্য তুলে ধরছি। ঢাকা জেলার অন্তরগত নবাবগঞ্জ উপজেলার ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত আলগীচর গ্রাম। কোথাও কোন চরের নিদর্শন বা অস্তিত্ব না পাওয়া যাওয়ায় এই গ্রামের নামকরণের ব্যাখ্যা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হলো না বলে দুঃখিত।এই গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামের নামগুলো যাথাক্রমে বলমন্তচর, উঁড়ার চর এবং নদীর অপর পারের একটি গ্রামের নামও বালুর চর। কয়েক মাইল দুরে রয়েছে পদ্মা ও মেঘনা নদী।

আমার ধারণা শত শত বছর পূর্বে এই গ্রামগুলিও হয়তো ছিল পদ্মা বা মেঘনা নদীর অংশ এবং এক সময় হয়তো নদীবক্ষে জেগে উঠেছিল বিশাল চর আর সেই চর ভাগাভাগি করে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের মাধ্যমে সৃষ্ট গ্রামের নাম করণ ও লোকের বসবাসের শুরু হয় শত শত বছর পূর্বে। সে যাই হউক, ফিরে আসছি আলগীচর গ্রামে। ইছামতি নদীর তীরের এই গ্রামটি সবুজে ঘেরা। প্রকৃতি যেন সৌন্দয্যকে উজার করে দিয়েছে গ্রামটিতে। গ্রামটির বর্তমান জনসংখ্যা ১,৬৬৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৭৮৯ জন ও নারী ৮৭৯ জন আর ভোটার ভোটার সংখ্যা হচ্ছে ১২০০ জন। কয়েক ঘর হিন্দু ধর্মালম্বী ছাড়া বাকিরা ইসলাম ধর্মের। গ্রামটিতে রয়েছে তিনটি মসজিদ, একাধিক মাদ্রাসা, দুইটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি নির্মানাধীন উচ্চ বিদ্যালয়, একটি সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয় ও কবরস্থান। রয়েছে দুইটি ফুটবল খেলার মাঠ, একটি ভলিবল খেলার মাঠ। এই গ্রামে ইছামতি নদীর পাড়ে এক সময় বসত দৈনিক কাঁচা বাজার। একই স্থানে বসতো সপ্তাহে একদিন ধানের হাট, বর্ষায় নৌকার হাট এছাড়াও ছিল বাংলাদেশের বিখ্যাত বাশের হাট। যদিও হাট বা বাজার এখন আর মিলছে না।

এবার আসছি মূল ঘটনায়। গ্রামটিতে রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট বড় পুকুর। গ্রামের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে একাধিক খাল যা ইছামতি নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। বর্ষায় খালগুলি ব্যস্ত হয়ে উঠে নৌকা চলাচলে ও খালের দুই পাড়ের মানুষের গোছলের জন্য। বর্ষা শেষে যখন পানি কমে যায় তখন প্রচুর মাছের যাতায়াত শুরু হয় এই খালগুলি দিয়ে। এই সময় মাছ ধরার জন্য স্থানীয়রা ব্যস্ত হয়ে উঠে, বলাচলে শখের বসবর্তী হয়ে। একটি খালের শেষ প্রান্তে রয়েছে একটি মজা পুকুর যা বাবু মিয়ার পুকুর হিসাবে পরিচিত। বাবু মিয়ার পরিবারবর্গ ঢাকায় থাকায় পাকা বাড়ীটি ফাঁকা, আর বাড়ীরই অংশ এই উল্লেখিত মজাপুকুর। পুকুরের এক সময়ের সান বাঁধানো ঘাট ইঁট উঠতে উঠতে ৮০ উর্ধ্ব বসয়ী বৃদ্ধ/বৃদ্ধার মুখের দুই একটি দাঁত বাদে প্রায় সব দাঁত হারানোর মত অবস্থা। পুকুরের চারপাশে ও আশেপাশে ঝুপঝাড়, জঙ্গল। সাপের আনাগুনা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ১৯৮০ সালের এক বিকেলে রাকিব (বর্তমানে আষ্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত), মনির, কুটি, আক্তার ও মতিন লক্ষ্য করলো খাল দিয়ে প্রচুর মাছ যাতায়াত শুরু করেছে। ওরা পরিকল্পনা করলো ঐ রাত্রেই জাল পেতে মাছ ধরবে। যেই কথা সেই কাজ। প্রস্তুতি নিয়ে মাছ ধরতে বসে গেল। যেই জায়গায় ওরা বসলো তার ১৫০/২০০ গজ দক্ষিণে কবরস্থান। পূর্বে হিন্দু গ্রাম শুভরিয়া, পশ্চিমে আনুমানিক ৫০/৬০ গজ দূরত্বে বিরান ভিটা, অসংখ্য গাছ-গাছরা আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ যা লেংরির ভিটা নামে গ্রামে পরিচিত। সবার ধারণা এখানে ভূতের বসবাস। সন্ধ্যাতো দুরের কথা দুপুরেও এই পথে কেউ পা বাড়ায় না। ওদের বসার জায়গা থেকে বাবু মিয়ার বাড়ীর পুকুর আনুমানিক ৪০/৪৫ গজ দূরত্বের মধ্যে।

অন্ধকার রাত, ওরা রাত আনুমানিক ১২টার দিকে পৌছে গেল মাছ ধরতে। মাছ ধরার পদ্ধতি লম্বা একটি জাল এমনভাবে পাতা থাকবে যাতে মাছ প্রবেশ করলে আর বেরুতে না পারে। যা করতে হয় মাঝে মাঝে মাছ জাল থেকে তুলতে হয়। যাতে করে ঘুমিয়ে পরলে আশ পাশ থেকে শিয়াল এসে মাছ না খেতে পারে।

যারা মাছ ধরতে বসেছে তাদের বয়স প্রায় সকলেরই ১৭/১৯ এর মধ্যে। এ ধরনের আয়োজনে সিগারেট থাকাটা যেন অনিবার্য্য। কারণ বাড়ী থেকে বাইরে থাকায় সিগারেট খাওয়ার এটা সুবর্ণ সুযোগ, তাছাড়া ধারনা-আগুনের সামনে ভূত আসতে পারে না। রাতে যাতে ঘুমও হয় আবার মাছও ধরা যায় (কলাবেচা আর রথ দেখার মত অবস্থা) এই ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত হলো একজন জেগে থাকবে

বাকিরা ঘুমাবে, এই ভাবে পালাক্রমে মাছ ধরা আর ঘুমানো হবে। সাথে মাদুর রয়েছে। মাথার উপর খোলা আকাশ। কিছুক্ষণ একসঙ্গে আড্ডা দেওয়ার পর একজন বাদে বাকীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। অন্ধকার রাত ক্রমশ গভীর থেকে গভীর হতে লাগলো। পালাক্রমে জেগে থাকার পালা এবার আক্তারের (আক্তার অত্যন্ত ভীতু প্রকৃতির)। এছাড়াও দলের মধ্যে মনির ও মতিন উভয়েও যথেষ্ট ভীতু। সাহস রয়েছে কিছুটা রাকিব ও কুটির। রাত প্রায় আড়াইটা। আক্তার জেগে আছে, বাকিরা ঘুমিয়ে। আশে পাশে মাছের দাপাদাপি, বিরান ভিটা আর করবস্থান থেকে শিয়ালের ডাকাডাকি যেন বেড়ে গেল। পাশের গ্রাম থেকে হিন্দুদের পুজার কাশ ও ঢুলের শব্দে পরিবেশ ক্রমশ ভারী হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে আক্তারের মনোজগতে ভূতের আনাগুনা শুরু হয়ে গেছে। অনিচ্ছা সত্বেও একাধিক ফাঁসির মারার ঘটনা আক্তারের মনে এসে ভীর জমাতে শুরু করলো। মাঝে মাঝে বিরান ভিটা থেকে পাখির ডানা ঝাপটানো ও কিচিরমিচির শব্দকেও আক্তার মনে মনে ভূতের আগমনের পূর্বাভাস মনে করতে শুরু করেছে। ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছে । এক পর্যায়ে ভূতের নানাবিধ চিন্তা করতে করতে যখন বাবু মিয়ার মজা পুকুরের দিকে তাকিয়েছে অমনি অঘটন। ঘটে গেল ভৌতিক কান্ড। গলা পানির সেই পুকুরের মাঝখান থেকে বিশাল এক আগুনের কুন্ডলী উপর দিকে উঠে আকাশে মিলিয়ে গেল একই সংগে পুকুর পাড়ের গাছ থেকে কি যেন উড়ে গেল। আক্তার কোনমতে উচ্চারণ করলো- লা ইলাহা ইল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। অন্যদের ডেকে উঠানোর মত অবস্থা না থাকলে কোনমতে অন্যদের জাগিয়ে ঘটনা বুঝানোর চেষ্টা করলো। অন্যরা বিষয়টির পাত্তা না দিয়ে সকলে একসঙ্গে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। বসতে বসতে সকলে যখন ক্লান্ত এক পর্যায় এবার আবারো মজাপুকুরের মাঝখানে আগুনের কুন্ডলী দেখতে পেলো। আগুনের কুন্ডলী চারি দিক আলোকিত করে আকাশে মিলিয়ে গেল। এবার সকলে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা ভৌতিক। ওরা হারিয়ে ফেললো সমস্ত মনোবল।

সকলে কোনমতে কলমা পড়ার চেষ্টা করলো। নিজেরা বলতে লাগলো এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ঠিক হয়নি। ওরা বাড়ীর ফেরার সাহস ও হারিয়ে ফেললো। রাত গড়াতে লাগলো। ওদের ধারণা ভোরে ফজরের আজান পড়লে ভূত চলে যাবে তখনই ওরা বাড়ী ফিরবে। ভোর হতে এখনো অনেক বাকী। আবারও আগুন। এবার আগুনের কুন্ডলী পুকুরের মাঝ খান থেকে নয়, বিরান ভিটা থেকে। আক্তার মনির আর মতিনের দাঁত লাগার মতো অবস্থা।

আবার সব নিঃস্তব্ধ। ওরাও চুপচাপ কিন্তু ভয়ে আরষ্ঠ। বিরান ভিটার পাশে ফাকা জমি। জমিতে পাতা পানি। জমির আশে পাশে ছোট ছোট হিজল গাছ। গাছগুলিকে মনে হচ্ছে কারা যেন বসে আছে। ওদের বসে থাকার জায়গা থেকে জমির দুরত্ব আনুমানিক ২০/৩০ গজ মাত্র।

এবারের ঘটনা আরো ভয়াবহ। চার দিকে ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দে ও কবরস্থান থেকে ভেসে আসা শিয়ালের ডাকে ভারী হয়ে আসছিল পরিবেশ। এরই মধ্যে জমির পাতা পানিতে কারো হাটার চপ্... চপ্... চপ্... শব্দ কানে এলো। শব্দ ক্রমশ এগুচেছ। ওদের শরীরের লোম ভয়ে খাড়া হয়ে গেল। ওরা বুঝতে পারলো সারাজীবন ভূতের গল্প শুনলেও আজ সত্যিকারের ভূতের কবলে পড়েছে। ওরা ভাবছে হয়তো আজ আর প্রাণ নিয়ে ঘরে ফেরা হবে না।

আসন্ন মহা বিপদের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হতে লাগলো। এরই মধ্যে নাকা নাকা কন্ঠে শব্দ শুনলো। মাঁছ দৈ------- মাঁছ খাঁমো। এবার জীবন বাঁচানোর জন্য এক সঙ্গে ওরা বাড়ীর দিকে উঠি পরি করতে করতে দৌড়ে কোন মতে বাড়ী পৌছে সেই রাতের জন্য প্রাণে বাঁচলো।

পরের দিনের ঘটনাঃ- পরের দিন সন্ধ্যায় এক বাড়ীতে আক্তার বসে আছে। কেরোসিনের চুলায় চা বানাচ্ছে বাড়ীর একজন। কেরোসিনের চুলার আগুনের দিকে দৃষ্টি যেতেই আক্তার ভূত, ভূত, ভূত বলে আজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। জ্ঞান ফেরার পর আক্তার উপস্থিত সকলের কাছে গত রাতের ভৌতিক ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিল। এবার ভৌতিক ঘটনাটি গ্রাম ভরে ছড়িয়ে পড়লো। মুরুব্বীদের পরামর্শক্রমে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে ফকির (ওঝা) আনা হলো।

ফকিরের বক্তব্যঃ- ওদেরতো আসলটায় পাইছিলো। অল্পের জন্য বাইচা গেছে। ধারানী দিতে অইবো। ফকির গলায় ধারণ করতে তাবিজ দিয়ে চলে গেল । তাতে অবস্থায় উন্নতি না হওয়ায় বরং অবনতির দিকে ধাবিত হওয়ায় আমি চিন্তিত হয়ে পরলাম। কারণ ঐ রাতের ভূতের ভূমিকায় ছিলাম স্বয়ং আমি নিজে। কিন্তু কেন ? আসলে এ ধরনের যে কোন আয়োজনে সব সময় আমি দলে থাকতামই। যে কোন কারণে বা ভুলে ঐ দিনের মাছ ধরার আয়োজনে ওরা আমাকে ওদের সঙ্গে নিতে ভুলে গিয়েছিল। আর তাই আমি প্রতিশোধ নিতে এই ভূত ভূত খেলার দুঃসাহসিক অভিযানে নেমেছিলাম। ঐ রাতে আমি ছিলাম ভূতের ভূমিকায়- যখন ওদের বলেও বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না তখন ওদের সকলকে স্পটে নিয়ে কাদায় আমার পায়ের ছাপ মিলিয়ে দেখিয়ে ও সেভলনের শিশি থেকে মুখে

কেরোসিন নিয়ে তা জ্বলন্ত লাইটারের সামনে ফুৎকার দিয়ে আগুনের কুণ্ডলী বানিয়ে দেখিয়ে ঐ রাতের ভৌতিক ঘটনার অন্তরালের কাহিনী শেষ পর্যন্ত বুঝাতে সক্ষম হই। এটা ওদের ও আমার জীবনের স্মৃতিপটে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

রচনাঃ০৬-০৮-১৩ সিডনী

E-mail : mohammad.jalil@yahoo.com